ভালবাসো মোর গান : নজরুল ইসলাম

যূথিকা বসু

মাঝে মাঝে একটা কথা মনে হয় যে, আমরা যারা বাঙালি হয়ে জন্মেছি, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংগীতের জগতে অবগাহন করতে পেরেছি, বাঙালির অনুভব নিয়ে বিশ্বকে, মানুষকে, মানবিক নানা সূক্ষ্মভাব ও ভাবনাকে অনুভব করতে পেরেছি, তারা বলতেই পারি 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' ইতিহাস নয়, ধর্ম নয়, রাজনীতি নয়— বাংলা গানের অযুত ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে রয়েছি আমরা—এ বড় কম গর্ব এবং সৌভাগ্যের কথা নয়। বাংলা গানের জগতে যে-সব শ্রদ্ধেয় নাম নির্দ্বিধায় লেখনীর মুখে এসে পড়ে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল। সমস্ত সূক্ষ্মতার প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে অগ্রণী।

বেশ কিছুকাল যাবৎ রবীন্দ্রসংগীতের প্রবল জোয়ারে দেশকাল ভেসে যাচ্ছে। এর থেকে এমন মনে করা অবশ্যই যেতে পারে না যে, এই প্রবল জোয়ারের দোলায় যাঁরা ভেসে গিয়েছেন তাঁরা সবাই রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক বোদ্ধা। বরং গায়ক-গায়িকা ও শোতৃমন্ডলীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর মর্মে কজন গায়ক-গায়িকা কিংবা কজন শ্রোতাই বা প্রবেশ করতে পারেন? তবে কি এই জোয়ার নিছকই একটা হুজুগ? একেবারে নয়, এমন বলি না। তবুও মনে হয়, গায়ক-গায়িকা বা শোতৃমন্ডলীর অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর মর্ম না বুঝেও কোথাও একটা সম্ভবত সহমর্মিতা অনুভব করেন। বিশেষ বিশেষ গানের ভাব শ্রোতার মনের মধ্যে এমনই এক ব্যাকুলতা তৈরি করে যাকে বলা যায় 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে।' 'ছন্দ' গ্রন্থের 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে নিয়ে। যে-মানুষ রচনা করে আর যে-মানুষ ভোগ করে।' গানের রাজ্যে অবশ্য আরও একজন আছেন, তিনি গায়ক।

গায়ক তাঁর অনুভব ও প্রকাশক্ষমতা দিয়ে গানের ভাবকে যদি শ্রোতার অনুভূতির দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারেন তবেই সার্থকতা গায়কের আর সহমর্মিতা শ্রোতার।

যে-কোনোও সংগীতের মুখ্য আশ্রয়—কথা এবং সুর। বাণীপ্রধান সংগীত এবং সুরপ্রধান সংগীত—এই দুয়ের মধ্যে কার গুরুত্ব অধিক তা এককথায় বলা সহজ নয়। তবে সাধারণত বাণীকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলার স্বাভাবিক প্রবণতা তো আছেই। 'সমালোচনা' গ্রন্থের 'সংগীত ও কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না— কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয় স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগ রাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগ রাগিণী।... কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।

সুতরাং বাণীপ্রধান গান বলতে ভাবপ্রধান গানকেই বোঝায়। তবে সংগীতে সুরের স্থানও বিন্দুমাত্র নগণ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ ভাব বিশেষ বিশেষ সুরের অপেক্ষায় থাকে আবার উল্টোটিও সত্য। এইভাবে বাণী ও সুরের রাজযোটক মিলনেই সংগীতের প্রকৃত সার্থকতা। এই দুইয়ের হরগৌরী মিলনে গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে এক অনির্বচনীয় অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পুনরায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেই বলা যায়, 'সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।'

তবে রবীন্দ্রনাথ এ কথাও বলেছেন, 'কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে সংগীত ততখানি করে নাই।' হয়তো এই কারণেই অনেক সময় আমরা উপলব্ধি করি যে, খুব উন্নত ভাব না হওয়া সত্ত্বেও সুরের মোহের আকর্ষণে কোনোও কোনোও গান আমাদের অনুভবতন্ত্রীতে একটা অনুরণন তোলে যার মায়াজাল ছিন্ন করা প্রকৃত গীতরসিকের পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কথা ও সুর উভয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

> কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে।... ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। ... যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আমার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে।

অতএব সংগীতে কথা ও সুর অর্থাৎ ভাব ও সুর উভয়েরই প্রায় তুল্যমূল্য স্থান। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে নজরুলের গানকে বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। নজরুল গান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'গানের কথার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভাবি গানের সুরের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি' কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রোতা যদি গানের সঠিক বোদ্ধা হন তবে গানের কথা বা ভাব তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা যদি সঠিক উপলব্ধ হয় তবে শ্রোতার কাছে গানের কথা

থেকে সুর পৃথক হয়ে থাকে না। অনেকে আবার গান শুনে তৃপ্ত হন, কিন্তু তৃপ্তিটুকু গানের কথা অথবা সুর কিসের জন্য তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সাধারণ শ্রোতা যার সুরজ্ঞান তত প্রখর নয়, তিনি গানের কথাকেই অধিকতর মর্যাদা দেন এবং সুরকে কথার পিছনে পিছনে অনুগতা স্ত্রীর মতো মনে করে তৃপ্তিলাভ করেন। নজরুল সংগীতে বাণী ও সুর —কোনও কোনও ক্ষেত্রে উভয়ের সহাবস্থান, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুরেরই ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ অস্বীকার করার নয়। রবীন্দ্রসংগীতে সর্বত্রই বাণী ইন্দ্রিয়লোক পরিত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনায় পৌঁছে যায় এবং সেটাই নিঃসংশয়ে আমাদের কাছে চূড়ান্ত প্রাপ্তি—নজরুল সংগীতে অবশ্য সম্পূর্ণ তেমনটি নয়। নজরুলের গানে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার চেয়ে মানবিক আবেদন অনেক বেশি। যখন শুনি 'মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা' তখন গানের কথা শ্রোতাকে উদাসী ও বেদনার্ত করে তোলে ঠিকই, কারণ গানের কথার মধ্যে যে মানবিক বিরহ-বেদনার আর্তি ঝরে পড়ে তাকে অস্বীকার করবে শ্রোতা কেমন করে? আবার ধরা যাক 'ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি হায় সন্ধ্যায়'-এ পূরবীর সকরুণ বেদনায় কত অতীত রুদ্ধ দুয়ার নিমেষে খুলে গিয়ে এক বোবা কান্নায় সমস্ত সত্তা কি আলোড়িত হয়ে ওঠে না? হয়তো মনে হতে পারে যে, এই উদাহরণগুলির সবই করুণ রসাত্মক বলেই তার একটা স্বাভাবিক আবেদন আছেই। সে কারণেই 'এত কথা কি গো কহিতে জানে চঞ্চল ঐ আঁখি', 'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়াছিলে', 'তুমি আমার সকাল বেলার সুর', 'আমার ঘরের মলিন দীপালোকে' এই সব গানে প্রেমের যে ব্যাকুলতা তা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক শ্রোতার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। এখানে শ্রোতার শিক্ষার প্রয়োজন তত নেই যত আবেগ ও অনুভবের প্রয়োজন আছে। শ্রোতার অন্তরের অনুভবের তারে গানের কথা ও সুরের অনুরণন জাগে আর সেখান থেকেই সমস্ত সত্তা আবেগাপ্লুত হয়। আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ যেন প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠে এসেছে নজরুলের গানে, আর সে কারণেই নজরুলের গানকে অনেক বেশি বাস্তব জীবনের উষ্ণতায় ভরপুর বলে মনে হয়। সমালোচক ধীরেন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'নিরক্ত প্রেমের গান প্রাণবন্ত হয়ে উঠল নজরুলের হাতে'। ১৯২৮ সালের 'সাপ্তাহিক সওগাতে' নজরুল সম্পর্কে লেখা হয়েছিল,

> কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার প্রাণ মাতানো সংগীতের দ্বারা শোতৃমন্ডলীকে মুগ্ধ করেন। শোতৃমন্ডলীর ভিতর হইতে অনবরত 'গান', 'কবিতা', 'নজরুলের গান চাই কবিতা চাই', প্রভৃতি ঘন ঘন চিৎকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। সকলের অনুরোধে এ দিনও কবি তাঁহার মধুর সঙ্গীত ও কবিতায় সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার করেন।

'নজরুল ও সাময়িক পত্র' গ্রন্থে মোবাশ্বের আলী 'সওগাত' পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে একথা জানিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে,

নজরুলের গানের গলা মোটেই ভাল ছিল না, একটা ভাঙা বা ধরা আওয়াজ ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর গানের এই চাহিদাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, কথায়-সুরে এমন এক উন্মাদনা, এমন এক উষ্ণ আবেগ ও আবেশ ছিল যা শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখত আর সে কারণেই তাঁর গানের চাহিদাও ছিল অফুরন্ত।

নজরুলের প্রেমের গানগুলি অসামান্য। এই গানগুলি শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটিই কানে বাজে,

> যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গাযমুনাসংগম

আর ঠিক এই কারণের জন্যই নজরুলের যে-কোনোও গান এত আন্তরিক হতে পারে। এখানে গানের বাঁধনদার আর গায়ক তো একই ব্যক্তি, ফলে মমত্বের অভাব বিন্দুমাত্রও ঘটে না। প্রেমের গানগুলির রসভান্ডার নিঃশেষিত হতে চায় না যেন। যদিও একথা ঠিক নজরুলের প্রেমের গান মানবিক উষ্ণতায় ভরপুর, তবু বলি, সে উষ্ণতায় কোনো কাঙালপনা নেই, আছে শুধু প্রেমিক প্রেমিকার পারস্পরিক মুগ্ধতা, সৌন্দর্যে মগ্নতা। জীবনকে মানবিক আবেগের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা আছে এসব গানে, নেই কোনো স্থূলতা। নজরুল যখন লেখেন,

> তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়
> সেকি মোর অপরাধ

তখন সুন্দরকে দু-চোখ ভরে দেখার জন্য প্রেমিকার আকুলতা নিঃশেষে ঝরে পড়ে। প্রিয়তমা তার প্রিয়তমের প্রতি আকর্ষণকে কখনোও চাঁদ-চকোরিনী, কখনও সূর্য-সূর্যমুখীর উপমায় রঞ্জিত করে। প্রতিটি উপমার মধ্যেই সুন্দরকে দেখার নিষ্পাপ দৃষ্টিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ জগতে সুন্দরকে কোন মানুষ না দেখতে চায়? কবির বিধিপ্রদত্ত আঁখিদুটি যেন সুন্দরকে দেখার জন্যই পাওয়া। সমস্ত অসুন্দরকে বর্জন করে যিনি এমন করে সুন্দরের আরাধনা করতে পারেন তাঁর গানের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় কি? সুন্দরকে দেখার এই আকুলতা কেবলমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই নয়, যেখানে নজরুল বলেন,

> একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লীজননী

কিম্বা খোদার মেহেরবাণীতে যেখানে সুন্দর ফুল আর সুন্দর ফল আর মিঠানদীর পানি-দ্বারা সমৃদ্ধ শস্য-শ্যামল এই বাংলাদেশের কথা বলেন অথবা ভক্তিমূলক গানে শ্যামার রূপবর্ণনায় যখন গীতিকার লেখেন,

> আমার মা যে গোপাল সুন্দরী।
> যেন একই বৃন্তে কৃষ্ণকলি, অপরাজিতার মঞ্জরী

কিংবা

আমি সুন্দর নহি, জানি হে বন্ধু, জানি
তুমি সুন্দর, তব গান গেয়ে নিজেরে ধন্য মানি।।

সেখানেই যেন নজরুলের মনের কথাটি স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে যায়,

আসিয়াছি সুন্দর ধরণীতে
সুন্দর যা'রা, তাদের দেখিতে।
রূপ-সুন্দর-দেবতার পায়
অঞ্জলি দিই বাণী।।
রূপের তীর্থে তীর্থ-পথিক যুগে যুগে আমি আসি,
ওগো সুন্দর। বাজাইয়া যাই তোমার নামের বাঁশি।
পরিয়া তোমার রূপ-অঞ্জন,
ভুলিছে নয়ন, রাঙিয়েছে মন।
উছলি' উঠুক মোর সঙ্গীতে
সেই আনন্দখানি।।

এই সৌন্দর্য আরাধনার ক্ষেত্রে দেশ, দেবী এবং নারীতে কোনও পার্থক্য নেই। সকল ক্ষেত্রেই নজরুলের রূপারাধনার স্বপ্নমেদুরতা ও নির্মলতা যেন আমাদের সমস্ত স্থূলতা, সংকীর্ণতা ও তুচ্ছতার ঊর্ধে নিয়ে যায়। এসব সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে সর্বদা যে কোনও অতীন্দ্রিয় ভাবনার প্রগাঢ়তা আছে, তা নয়। কিন্তু মানবিক যে ভাল-লাগার আবেশ, তারই বা মূল্য কম কি ? এমন করে নিষ্পাপ দৃষ্টিতে দেখতে শিখলেই তো অতীন্দ্রিয় অনুভবে পৌঁছনো সম্ভব হয়। নজরুলের গান যেন সেই প্রচেষ্টারই সফল প্রয়াস।

নজরুল এপার বাংলা অথবা ওপার বাংলার কবি এই বিতর্ক যেমন অর্থহীন বলে মনে হয়, তেমনি অর্থহীন মনে হয় তিনি সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক—তার বিচার। নজরুল যে ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন সেখানে হিন্দুর দেবদেবী এবং ইসলামের আল্লা দুই-ই আছে এবং উভয় গানের মধ্যেই গীতিকারের আন্তরিকতা ও ভক্তির লেশমাত্র কম-বেশি নেই। গীতিকার যখন লেখেন,

আল্লাহ্ আমার প্রভু — আমার নাহি নাহি ভয়
আমার নবী মোহাম্মদ, — যাঁহার তারিফ জগৎময়।।
আমার কিসের শঙ্কা?
কোর্‌আন্ আমার ডঙ্কা,
ইস্‌লাম আমার ধর্ম — মুসলিম আমার পরিচয়।।

তখনও ইসলামের প্রতি যে ঐকান্তিকতা ও নির্ভরতা দেখি, ঠিক তাই দেখি যখন তিনি লেখেন,

বল মা শ্যামা বল,—তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে?
আমি, যতই দেখি ততই কাঁদি, ঐ রূপ দেখি মা সকল খানে।।
মাতৃহারা শিশু যেমন মায়ের ছবি দেখে
চোখ ফিরাতে নারে মাগো, কাঁদে বুকে রেখে।
তোর মূর্ত্তি মোরে তেমনি ক'রে টানে মাগো মরণ টানে।
তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে।।

নজরুলের মতো একজন ইসলামি লেখকের পক্ষে কেমন করে এহেন শ্যামাসংগীত কিংবা,

সখি, আমিই না হয় মান করেছিনু তোরা তো সকলে ছিলি;
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি, কেন নাহি ফিরাইলি

এর' মতো কীর্তন লেখা সম্ভব হল ভাবলে বিস্মিত হতে হয় বইকি! কিন্তু এর সমাধান তেমন কঠিন নয়। প্রকৃত পক্ষে 'আল্লা'ই বলি, কিংবা 'ভগবান', 'কৃষ্ণ'—গীতিকারের মনের মধ্যে থাকে সেই বিশ্বশক্তির ছবি যা সমস্ত বিশ্বে অনুসৃত হয়ে থাকে, ইংরাজিতে যাকে বলি 'power' —তা নারী অথবা পুরুষ, হিন্দু অথবা মুসলিম—এইসব বিতর্কের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। মনে হয়, নজরুল অধ্যাত্মচেতনার সেই একটা জায়গায় পৌঁছতে পেরেছিলেন যেখানে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রতি মানুষের যে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন—তাই প্রথম ও শেষ কথা। তাই একই লেখনী লেখে 'আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়' এবং 'তুমি আনন্দ-ঘনশ্যাম, আমি প্রেম পাগলিনী রাধা।' এখানে শুধু ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, হিন্দু অথবা মুসলমানের নয়। বস্তুত নজরুলের মনের কথা তাঁর নিজেরই রচনার উল্লেখ করে বোঝানো যায়,

কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান
সে যে রে তোর মাঝে রয়,
চেয়ে দেখ সে তোর মাঝে রয়।
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ
খুঁজিস যারে পাহাড় জঙ্গলময়।
চেয়ে দেখ সে তোর মাঝে রয়।।
আঁখি খোল ইচ্ছা অন্ধের দল
নিজেরে দেখ না আয়নাতে
দেখবি তোরই এই দেহে
নিরাকার তাঁহার পরিচয়
ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর;
ইহাতে অসীম নীলাম্বর
এ দেহের আধারে গোপন
রহেরে বিশ্ব চরাচর,

প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশ্‌তে, স্বর্গে—কোথাও নয়।।
এই তোর মন্দির, মসজিদ্‌
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল্‌
কোথা তুই তীর্থে যাবি মন
এই তোর মক্কা-মদিনা;
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়।।

নজরুল যেখানে কীর্তন রচনা করেন সে গানের সৌন্দর্যেও মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। স্কুল পালানো ভবঘুরে জীবনের সঙ্গে মনটিকেও কোথাও নির্দিষ্ট বাধনে বেঁধে রাখেননি তিনি। মনের অসীম প্রসার সেই উদাসী মুক্ত জীবনেরই ফসল। এইসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের সংস্কার ছাড়া আর কিছুই কাজ করেনি। তাঁর বিধিদত্ত আয়তনের দুটিই বলে দেয় যেন, সমস্ত কিছুকে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করে, বিরাট করে, মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারতেন, দেখতে ভালোবাসতেন। আত্মার উপলব্ধি থেকে সে গান লেখা হয় এবং গাওয়া হয় তা তো একধরনের পূজাই—কখনও তা প্রেমের, কখনও ভক্তির, কখনও দেশমাতৃকার, কখনওবা প্রকৃতির। আন্তরিক আবেদনের কণামাত্র অসদ্ভাব এর কোনও অংশেই নেই।

নজরুলগীতির অসামান্যতা তাঁর সুরে নিশ্চয়ই। এত মর্মস্পর্শী হৃদয়গ্রাহী সুরের খেলা আর অন্য কোনোও গানে সম্ভবত পাওয়া দুরূহ। নজরুলগীতি সঠিক গাইতে হলে গায়ক বা গায়িকার শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার প্রয়োজন জরুরি। সুরে মীড়ের কাজ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুড়কির তান, গজলভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীকে ছুঁয়ে যাবার সাবলীল চেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে। আবাল্য যে সুরপ্রীতি তাঁর ছিল তা-ই তাঁকে ভাটিয়ালি, কীর্তন, বাউল, ঝুমুর, কাজরী, চৈতি প্রভৃতি বিচিত্র সুরবাহারের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। ওস্তাদ জমীরুদ্দিন খানের কাছে মার্গসংগীতের কিছু শিক্ষা তিনি একসময় নিয়েছিলেন। কিন্তু সুরকে যেভাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা কেবলমাত্র তালিমেই সম্ভব নয় যদি নিজস্ব ভাবনার প্রয়োগ না ঘটে। সুর যেন নজরুলের আজ্ঞাবহ দাসের মতো আহ্বানমাত্রেই সাড়া দিয়েছে। কী বিচিত্র তার ব্যবহার, কী দরদী তার প্রয়োগ। অসামান্য সুরক্রীড়া হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে যে অনুরণন তোলে তার স্থায়িত্ব ও মর্মস্পর্শিতার তুলনা মেলা ভার। জানা যায় যে, অনেক সময় আগে সুর ঠিক করে পরে তাতে বাণী বসিয়েছেন কবি। আবার অন্যের লেখা কবিতায় তাৎক্ষণিক সুরের আরোপ করেছেন অবলীলায়। কখনও বা নিজের লেখা কবিতায় অন্যকেও সুর বসাতে বলেছেন। যা ই তিনি করে থাকুন, এ কথা ঠিক যে তাঁর গানের বাণী সুরের সুধায় সিক্ত হয়ে শ্রোতার অন্তরকে নিঃসীম সুরসাগরে নিমজ্জিত করে। যত বিচিত্র শ্রেণীর গান তত

বিচিত্র তার সুরারোপ। সংখ্যার দিক থেকে বেশ কয়েক হাজার গান লিখে সুর সংযোজন করলেও একটির সঙ্গে আরেকটির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। শুনলে মনে হয় নজরুলের অন্তরে যেন ছিল সুরের এক অফুরন্ত খনি। এর জন্য কোনও সাধ্য সাধনা করতে হয়নি, চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন হয়নি। সুরের ঝর্নাতলায় শুধু তিনি নিজেই অবগাহন করেননি, শ্রোতাকেও করিয়েছেন। আর এই বিচিত্র সুরমায়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কোনও উন্নাসিকতা ছিল না; তিনি পথচারী, মাঝি-মাল্লা, ভিখারী, রাখাল বালক, নর্তকীর গীত কোনও কিছুকেই অবজ্ঞা করেন নি। তাছাড়া গ্রামোফোন কোম্পানিতে চাকরি করার সময় বিভিন্ন দেশের যে সমস্ত রেকর্ড তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলিও তাঁর কাজে লেগেছে। আশ্চর্য দক্ষতায় বিপরীত সুরকে তিনি একই গানে অনায়াসে ব্যবহার করেছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও শব্দ ছিল না। সন্ধ্যার সুরের সঙ্গে ভৈরবীর মিলনে এক অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। খাম্বাজ, পরজ-বসন্ত, হাম্বীর, আহীর-ভৈরব, দরবারী -কানাড়া, ভৈরবী, দেশীতোড়ী, মালগুঞ্জ, খাম্বাজ মিশ্র, হেমকল্যাণ, মিশ্র দেশ, যোগিয়া মিশ্র, কলাবতী, জয়জয়ন্তী, ধানী কার্ফা, পিলুমিশ্র প্রভৃতি প্রচলিত রাগ রাগিনীর পাশেই আছে অরুণ-ভৈরব, লাচ্ছাশামা, দোলনচাঁপা, নীলাম্বরী, সৈন্ধবী, পাহাড়ী কানাড়া, কর্ণাটকী-সামন্ত, মান্দ, কৌশিক, উদাসী-ভৈরব, সর্‌পর্‌দা, বসন্ত -মুখারী, মধুমাধবী সারং প্রভৃতি।

নজরুলের গান শোনামাত্রই অনেকক্ষেত্রেই গীতিকারের নাম বলা যায়। এমনটা সম্ভব হয়েছে কিছুকিছু গীতিকার ও সুরকারের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও সুর চিনিয়ে দেয় রবীন্দ্রসংগীতকে। দ্বিজেন্দ্রলালের মূলত সুর দ্বিজেন্দ্রগীতিকে চিনিয়ে দেয় এবং তাঁর গায়নভঙ্গিও। তেমনি নজরুলেরও সুর, গায়নভঙ্গি নজরুলের গানকে পরিচায়িত করে। গীতিকার যখন সুরকার হন তখন প্রত্যেক গীতিকারেরই সুরের ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য থাকে। নজরুলের গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথের মতো দার্শনিকতার স্পর্শ ততখানি নেই, একথা সত্য; তবে যে উদ্দীপনা উন্মাদনা এবং সুরের ঐন্দ্রজালিক ব্যবহার আছে তা-ই নজরুলের গানের মুখ্য পরিচিতি। খুব বড় মাপের গীতরচয়িতা এবং সুরকার না হলে এমনটি সম্ভব নয়। বাংলায় রাগপ্রধান গানের ব্যাপক প্রচলন তিনিই করেন। বৈচিত্র্যের সন্ধানী নজরুল তাঁর ব্যক্তিজীবনের মতোই গানকেও কোনও সীমানায় বেঁধে রাখেননি। স্তর থেকে স্তরে নানা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে নিজের পথটি তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন অবলীলায়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় আমরা জানতে পারি,

> আমি আর নজরুল্ দুজনে গিয়েছিলেম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তাঁর স্বরচিত গান শোনাতে বললেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল গাইল, 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল' আর 'এই শিকল পরা ছল', রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন গান শুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বললেন, 'নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরন আছে।'

আব্বাসউদ্দিন নজরুলকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ composer বা সুরকার বলে চিনেছিলেন। বুদ্ধদেব গুহ বলেছেন ঢাকায় নজরুলকে নিয়ে কি কাড়াকাড়ি, নজরুলের গানে শ্রোতার কি আত্মহারা ভাব! এসব মন্তব্য থেকে অন্তত এটুকু কথা স্পষ্ট যে, নজরুলের গানে সুরে-ভাবে এমন এক মাদকতা এবং মানবিক আবেদন ছিল যা শ্রোতাকে মোহমুগ্ধ করে রাখত। এমন স্বতঃস্ফূর্ত রচনা ক্ষমতা— গানের পিঠে গান লেখা, সুরের আন্দোলনে কথা সমাবেশও বিরল। গ্রামোফোন কোম্পানিতে হারমোনিয়ামটি সামনে রেখে বসে আছেন নজরুল বহুতর মানুষের বহু রকমের চাহিদা পূরণের জন্য। ডুবে গেছেন তিনি সুরসমুদ্রে, অতলস্পর্শী মনের গভীর গহন থেকে তুলে আনছেন গুনগুনিয়ে কখনও কীর্তন, কখনও ঠুংরী, কখনও শাক্তসংগীত, ভাটিয়ালি, কখনও মুর্শিদি বা স্বদেশী গান। এহেন প্রতিভা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভাকে! কোন দরদী অন্তর থেকে সুরের এই ঝর্ণাতলায় তাঁর অবস্থান তা বুঝতে হলেও তো দরদী মনই চাই। তাই নজরুলের গানের গায়নভঙ্গি দরদী না হলে গানের আবেদনও হয় ব্যর্থ— এই শুধু সুর সংযোজন নয়, সুরে অবগাহন।

'ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র' নজরুল তালে, রাগে, সুরে, বৈচিত্র্যে, ছন্দে যেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকে উল্কার সঙ্গে উপমিত করা যায়।*

---

* প্রবন্ধটি 'যুবমানস' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত